আহমদ ছফার কবিতা ঃ 'আমি তবু স্বতন্ত্র ঈশ্বর'

রহমান হাবিব

বাঙালির মননশীলতার জগতে আহমদ ছফা একটি অনন্য নাম। তাঁর রচিত কবিতাসমূহও তাঁকে বাঙালির কাব্যভাবনার একজন শেকড়-সন্ধানী ঋত্বিক হিসেবে প্রতিষ্ঠা দেয় বলে আমরা মনে করি। 'আমি তবু স্বতন্ত্র ঈশ্বর' বাংলা কবিতার ক্ষেত্রে আহমদ ছফার এ ঘোষণা তাঁর কোনো ঔদ্ধত্যপূর্ণ বক্তব্য নয়; বরং মৃত্তিকালগ্ন বাংলার কৃষক-সমাজের এক অন্তরঙ্গ ও বিশ্বস্ত প্রতিনিধি তিনি। আহমদ ছফার 'পুষ্প বৃক্ষ এবং বিহঙ্গ পুরাণ' ও 'সূর্য তুমি সাথী' উপন্যাস দুটির মধ্যেও আমরা বাংলার মাটি ও মানুষের প্রতি তাঁর প্রখর মমত্ববোধের পরিচয়ে বিধৃত হতে দেখি। তিনি শুধু একজন চিন্তাশীল এবং দূরদর্শী প্রাবন্ধিকই ছিলেন না; একইসঙ্গে একজন গল্পকার, ঔপন্যাসিক, অনুবাদক, সাহিত্য ও চিত্রসমালোচক এবং একজন গীতিকারও ছিলেন। যদিও তিনি লিখেছেন মননধর্মী সৃষ্টিশীল লেখার ফাঁকে ফাঁকে অবকাশ মুহূর্তের আনন্দ-সৃষ্টি ছিল তাঁর কবিতাগুলো; তবুও সে কবিতাসমূহে একটি গভীর কাব্যিক আবেগ এবং জীবনের প্রাকৃত ও নান্দনিক অভিজ্ঞতার শৈল্পিক মিশ্রণ ঘটেছে বলে মনে হয়।
বাঙালির মননশীলতার জগতে আহমদ ছফা একটি অনন্য নাম। তাঁর রচিত কবিতাসমূহও তাঁকে বাঙালির কাব্যভাবনার একজন শেকড়-সন্ধানী ঋত্বিক হিসেবে প্রতিষ্ঠা দেয় বলে আমরা মনে করি। 'আমি তবু স্বতন্ত্র ঈশ্বর' বাংলা কবিতার ক্ষেত্রে আহমদ ছফার এ ঘোষণা তাঁর কোনো ঔদ্ধত্যপূর্ণ বক্তব্য নয়; বরং মৃত্তিকালগ্ন বাংলার কৃষক-সমাজের এক অন্তরঙ্গ ও বিশ্বস্ত প্রতিনিধি তিনি। আহমদ ছফার 'পুষ্প বৃক্ষ এবং বিহঙ্গ পুরাণ' এবং 'সূর্য তুমি সাথী' উপন্যাস দুটির মধ্যেও আমরা বাংলার মাটি ও মানুষের প্রতি তাঁর প্রখর মমত্ববোধের পরিচয়ে বিধৃত হতে দেখি। তিনি শুধু একজন চিন্তাশীল এবং দূরদর্শী প্রাবন্ধিকই ছিলেন না; একইসঙ্গে একজন গল্পকার, ঔপন্যাসিক, অনুবাদক, সাহিত্য ও চিত্রসমালোচক এবং একজন গীতিকারও ছিলেন। যদিও তিনি লিখেছেন মননধর্মী সৃষ্টিশীল লেখার ফাঁকে ফাঁকে অবকাশ মুহূর্তের আনন্দ-সৃষ্টি ছিল তাঁর কবিতাগুলো; তবুও সে কবিতাসমূহে একটি গভীর কাব্যিক আবেগ এবং জীবনের প্রাকৃত ও নান্দনিক অভিজ্ঞতার শৈল্পিক মিশ্রণ ঘটেছে বলে মনে হয়।
রবীন্দ্রনাথ এবং নজরুলের কাব্যধারার স্বাতন্ত্র্যকে 'না বৈশাখ না জ্যৈষ্ঠ' কবিতায় চিহ্নিত করার মাধ্যমে স্বতন্ত্র কাব্যসত্তার অবস্থান নির্ণয় করেন তিনি। জন্মের বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য তিনি বাঙালির অকর্ষিত অথচ প্রাকৃত ও লোকজ কাব্যক্ষেত্রে তিনি তাঁর পদচারণাকে নিবদ্ধ করেন। বাঙালির কৌম ও কৃষি-সভ্যতার উত্তরাধিকারকে ধারণ করে গ্রামপ্রধান বাংলাদেশের কবিতার জগৎকে আবহমান বাঙালির কৃষিগত এবং নৃতাত্ত্বিক ভাবনার সঙ্গে সচেতন প্রণোদনায় সম্পর্কিত করতে চেয়েছেন তিনি তাঁর কবিতায়।
আহমদ ছফার 'কবিতা গান ইত্যাদি' (জেমিনি প্রিন্টার্স, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ১৯৯৩) গ্রন্থের 'বস্তি উজার' কবিতায় আহমদ ছফা গ্রাম থেকে শহরে চলে আসা ছিন্নমূল মানুষের বস্তিতে বসবাস এবং ১৯৭৫ সালে তৎকালীন রক্ষীবাহিনী কর্তৃক নীলক্ষেত বস্তি উজার প্রসঙ্গে কাব্যিক ও প্রতিবাদমূলক বক্তব্য তুলে ধরেছেন। গ্রামীণ মানুষ তাদের পূর্বপুরুষের ভিটি এবং লাঙলের মায়া এবং মাটির নিবিড় টান পেছনে ফেলে এবং
বীর হানিফার পুঁথির জগৎ এবং জ্যোৎস্নালোকে ভাসমান কন্যা সোনাভানের লোক-ঐতিহ্যিক মধুরতা বিসর্জন দিয়ে প্রাণ ধারণের জন্য মধুতে পিঁপড়ে জমার মতো শহরের বস্তিতে এসে ভিড় করেছে।
ফসলের অজন্মার অত্যাচার, বন্যার কারণে শস্য নষ্ট হওয়া, দুর্ভিক্ষের থাবা এবং ক্ষুধার নির্মম পীড়ন থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য পল্লীর ভ্রষ্ট নীড় মানুষরা শহরমুখী হয়েছে।
শহরের বিদ্যুৎ, পানি সরবরাহ, গাড়ি চলার উদ্দাম ব্যস্ততা এবং গ্রামের মানুষের মতে, 'আঙুরের মতো সুখ থোকা থোকা ঝুলছে শহরে/শহর চমৎকার।'
শহরে এসে গ্রামীণ মানুষরা বাঁশ ও কাঠ দিয়ে তাদের নতুন আবাস তৈরি করে এবং পেশাগতভাবে তারা

রিকশাচালক, মুটে, যোগালির কাজ করে, অফিসে আরদালিগিরি করে; কেউ এটা-ওটা বিক্রি করে, কেউ ছাতা মেরামত করে, কেউ পকেটে চালায় কাচি অর্থাৎ পকেটমার, কেউ কালো সন্ধ্যাবেলা করে বেশ্যার দালালি; এবং কেউ চাবি প্রস্তুতকারী; যারা'প্রকাশ চাবির রিং ঘুরে ঘুরে ঝিমঝিম দুপুরে বাজায়।'
কেউ চৌর্যবৃত্তি করে, কেউ জুয়াড়ি, নারীরা মেসে কাজ করে; বাড়ি বাড়ি রান্না করে। পুরুষ মেসবাসী অবসরে সে সোমত্ত সধবাদল মাতারীদের কাছ থেকে 'শিখে নেয় ডাগর ডাগর প্রেমের সুমধুর পাঠ।'
কোনো-কোনো নারী ধর্মভীরু হলেও তাদের চোখ রাঙানি নিমেষেই থেমে যায়; যদিও সারা রাত মিলাদের মাধ্যমে অশান্ত চেঁচানি করে তারা। মেসবাসী পুরুষদের প্রতি তাদের অসার তর্জন ক্রমশ দিন যাপন ও সময় ক্ষেপণের সঙ্গে সঙ্গে নিভে যায়। অতঃপর'মানে না বারণ তবু পাপস্রোত হুহু করে বাড়ে/যেমন নদীর জলে লেগেছে জোয়ার।'
বস্তিতে মধ্যে মাঝে চাঁদগা, নোয়াখালী, ফরিদপুর ও
বরিশালবাসীদের মধ্যে মারামারি, এমনকি'একটুও আশ্চর্য নয় দুয়েকটা হয়ে যায় আচমকা খুন।' খুনাখুনি, মারামারি ও বাস্তবতার কঠিন নিষ্পেষণে গ্রামের ছিন্নমূল মানুষের দিন যাপন চলে; স্বপ্নহীনভাবে তাদের জীবন কেটে যায়। কদাচ গভীর নিদ্রামগ্ন অবস্থায় ছেঁড়া কাঁথা ফুঁড়ে 'কম্পিত নক্ষত্র শিখা স্বপ্ন হয়ে ঝরে।'
উদ্বাস্তু এ নিরন্ন নিস্পিষ্ট মানুষের প্রাণের গভীরতল ভেদ করে জীবনের অন্তহীন আকাঙ্ক্ষা ও ভালোবাসাও তাদের মধ্যে জাগ্রত হয়। অথচ জীবনের রূঢ় বাস্তবতার নির্মম চাপে জীবন ভালো, না মৃত্যুবরণ ভালো সে দিশাও হারিয়ে ফেলে তারা। বস্তিবাসী মানুষের হতাশার গাঢ় আবরণ জমতে থাকলে, তারা বিক্ষুব্ধ ও বিদ্রোহী হয়ে ওঠে; কখনো কখনো'চ্যাংড়া শোলের মতো/লাফ দিয়ে প্রখ্যাত নেতার নামে করে জয়ধ্বনি।'
অথচ তাদের সজীব স্বপ্ন রক্ত-বমির মতো তাদের উত্তপ্ত কণ্ঠস্বরে নিষ্ফলভাবে ঝরে। ঘরহীন মানুষেরা দুঃস্বপ্ন-কাতর উদ্বিগ্নতা নিয়ে তাদের ভাসন্ত শ্যাওলার জীবন যাপন করে। তাদের গ্রামীণ সময় শুধু অতীত সুখস্মৃতি হয়ে থাকে; গ্রামের নারিকেলের হেলে পড়া ছায়া, নবীন ফাল্গুনে জাগা আম-কাঁঠালের বাগানের কচি কচি পল্লবের মায়া, নদীর বাঁকা স্রোত, হেমন্তে সোনালি ধান এবং মৃত্তিকাতলে নিদ্রিত তাদের পূর্ব পুরুষের স্মৃতিতে তারা ভারাক্রান্ত থাকে। তাদের অন্তর অস্তিত্বের আর্তনাদ'ঘর নেই, তবুও ঘরের মায়া প্রাণে বিঁধে আছে সর্বক্ষণ/স্বপ্নে শোনে পিতৃ পুরুষের স্বর, শোনে দেয়ার গর্জন/নদীর ছলছল স্রোত চোখে ভাসে, নতুন ধানের ঘ্রাণ/মগজের কোষে, সমীরিত মাঠ জাগে মনে/রক্তের স্পন্দনে বাজে বৃষ্টির ঝংকার।'
বস্তিবাসীর জীবন অনেক কষ্টের। মাঘ মাসের দীর্ঘ রাতে শীতে তাদের প্রচণ্ড কষ্ট হয়; বেআব্রু জীবনযাপন করে বস্তিবাসী নর-নারী। একবার, ওপর হতে জরুরি হুকুম আসে বস্তিবাসী জঞ্জালদের স্তূপ সরিয়ে ফেলতে হবে; কারণ তারা নাকি (মজুর, ফেরিওয়ালা, মুটে) তাদের অধিকার প্রাপ্তির জন্য ফন্দি ও নীলনকশা আঁকছে যে, জনবিস্ফোরণে তারা শহর ফাটাবে। রাষ্ট্রের নির্দেশে বস্তির ওপর বুলডজার এসে ভেঙে দিল বস্তিবাসীর নিবাস। আবাসহীন হয়ে পড়া বস্তিবাসীর দুঃখে নারী, বৃদ্ধ, যুবক, বস্তির কুকুর, শালিক এবং আকাশে উড্ডীন কবুতর বিষণ্ণতায় স্তব্ধ হয়ে পড়ে। যুবকদের কষ্টের তীব্রতা কবি চমৎকার উপমায় তুলে ধরেছেন'অধোমুখে অপরাধী যুবাদের দল নির্বিকার সহ্য করে/বড়ো ব্যথা, যেনো জীবন্ত ছাগল থেকে তুলে নেয় ছাল।'
বৃদ্ধদের নীরবতা মর্মান্তিক, করুণ'বুড়োরা ঠোঁটের ফাঁকে বিড়বিড় করে উচ্চারণ/খণ্ডাতে পারে না কেউ ললাট লিখন।'
জীবনের দুর্বিষহতার হাহাকার বস্তিবাসীদের মর্মন্তুদ বেদনাময়তায় ম্লান করে দেয়। তারা প্রতিশোধের আগুন জ্বালিয়ে দিতে চায়। গ্রাম থেকে বিচ্যুত বস্তিবাসী আর গ্রামে ফিরে যেতে চায় না; কারণ 'শিশু কি কখনো যায় মাতৃ জরায়নে'। তারা অনিকেত হওয়ার এবং আশ্রয় ও নিবাসহীন হওয়ার প্রতিশোধময়তায় প্রজ্বলন্ত হয়ে ওঠে, বস্তিবাসীর ভাষ্য'হে শহর গর্বোদ্ধত নিষ্ঠুর শহর/তোমার সঙ্কীর্ণ বক্ষে সবান্ধবে একদিন/ঢেলে দেবো মারাত্মক আজব কহর/গ্রাম খারিজের শোধ নেবো, সোনালী শস্যের/নামে লাগাবো তাণ্ডব, বইয়ে দেবো রক্তনদী/লালে লাল হবে রাজপথ, ক্ষেপা তরঙ্গের মতো সহিংস/আঘাতে/খুলে নেবো সভ্যতার ফ্যাকাশে বল্কল।'

'বস্তি উজার' একটি দীর্ঘ কবিতা। কবিতার বিষয় সমাজ-নির্ভর। গ্রাম থেকে চ্যুত বৃন্তহীন গ্রামীণ মানুষের শহরের বস্তিতে মানবেতর জীবনযাপন এবং তাদেরকে বস্তি থেকে উচ্ছেদের প্রসঙ্গ নিয়ে কবিতাটি রচিত হলেও কবিতার অন্তর্গত আবেগকে কবি কাব্যিকভাবে ব্যবহার করেছেন। নিছক সমাজ-নির্ভর নিরন্ন নিষ্পিষ্ট দরিদ্র মানুষদের নিয়েও যে কাব্যিক-অনুভব শিল্পিতভাবে প্রকাশ করা সম্ভব তা এ কবিতা পাঠে স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

কবি আল মাহমুদকে উৎসর্গীত 'ঘোষণাপত্র' কবিতাটি আহমদ ছফার কবি হয়ে ওঠার ঘোষণাপত্র। নিছক কাব্যিক অনুভবকে ধারণ করে কবিতাটি রচিত হয়েছে।

এক চাঁদনী রাতে তারাগুলো যখন হীরক খণ্ডের মতো জ্বলজ্বল করে জ্বলছিল; মশারিতে আঁকাবাঁকা হাওয়া এবং প্রকৃতিতে স্তব্ধ ঘনায়মান তাণ্ডব চলছিল; তখন কবি এক অদ্ভুত কাব্যিক অনুভূতিতে আচ্ছন্ন হচ্ছিলেন এবং তিনি যেন ঠিক তার মধ্যে ছিলেন না, যিনি রেডিও-টিভির প্রচার পাওয়ার জন্য যশের ধার ধারেন না এবং 'আপন রক্তিম হৃদয় নিয়ে বেঁচে আছে বলে (যিনি) গর্বিত', যিনি দাঁতখসা অধ্যাপকদের অসৃষ্টিশীলতাকে উপেক্ষা করেন এবং যিনি'মানুষের মনে হানা দিয়ে জায়গা করে নিতে জানে'।

সেই তিনি বছরের একটি সেরা খবর ঘোষণা করতে চান। যে খবরের কোনো ব্যানার হয়নি, রয়টার রিপোর্ট করেনি এবং টিভি কভারেজ দেয়নি। সে কবি হওয়ার সংবাদ কেউ প্রচার না করায় কবি দুঃখিত হননি; বরং তিনি বলেছেন, পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ও সূক্ষ্ম কাজগুলো নীরবেই ঘটে। যেমন কবি বলেছেন'যেমন ধরুন যৌবন প্রাপ্তির গোপন মধুর সংবাদ/প্রথম প্রেমে পড়ার বিস্মিত পুলক/আইনস্টাইনের মস্তকে আপেক্ষিক তত্ত্বের উদয়/কোন্ বাপের বেটা খবরঅলা এসবের খোঁজ রেখেছে;'

কবি সারা রাত জেগে যে ঘোষণাপত্র লিখেছেন; তাতে অনেকের অংশগ্রহণ করানোর ইচ্ছা কবির ছিল; কিন্তু তাতে কবি না গিয়ে নিন্দা প্রশংসা দুটোরই ভার নিজে বহন করার স্পর্ধা নিয়ে নিজেই কবি হওয়ার ঘোষণাপত্র লিখে ফেলেছেন। আকাশের তারাগুলো সভয়ে কবিকে সে অসমসাহসী কাজটি করতে দেখেছে। কবির এ কাব্যিক যুদ্ধ ঘোষণায় তিনি বুড়ো পণ্ডিত মশাইদের নিদ্রামগ্ন অবস্থাতেই মরে থাকতে বলেছেন, তাতে তারা বীরের সম্মান পাবেন। কারণ কবির নির্দেশে আগামী সকালে পৃথিবীর নবযৌবন প্রাপ্তি ঘটবে; তাই বৃদ্ধহীন যুবক-যুবতীমুখর পৃথিবী তিনি কামনা করছেন। আসলে বৃদ্ধদের মৃত্যু এখানে প্রতীকী অর্থে, বৃদ্ধ পণ্ডিত যাঁরা শুধু বাস্তবতার ধার ধারেন, আবেগ ও অনুভবের সমীপবর্তী হন না তাদেরই তিনি তাঁর কাব্য পৃথিবী থেকে নির্বাসিত করেছেন। কবি ধর্মগুরুদের শখের আলখাল্লাগুলো খুলে ফেলে তাদের থিয়েটার হলে নিপুণ অভিনয় দেখে মুগ্ধতায় আচ্ছন্ন হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন; তাদের কবিতা পাঠের আসরে উপনীত করতে চেয়েছেন; যাতে তারা কবিতার আগুনে তাদের অন্তর শিক কাবাবের মতো সেঁকতে শেখে। ধর্মগুরুদের মনে কাব্যিক অনুভবের রহস্যময় স্বপ্নিল আবহ সৃষ্টির আকাঙ্ক্ষা কবিকে সর্বশ্রেণীর জনমনে কবিতার স্পন্দিত চৈতন্য প্রবেশ করানোর কাব্যগত ইচ্ছার বহিঃপ্রকাশ।

কবি ঘোষণাপত্র লেখার সময় ধ্রুব নক্ষত্রকে সারা বছর মনোযোগী থাকার নির্দেশ দিয়েছেন, কবির মনে যেহেতু অতীত স্মৃতির দুঃখ বিঁধে আছে তাই অহঙ্কারি রুপালি চাঁদের প্রতি কবি বিক্ষুব্ধ, তাই চাঁদকে তিনি স্বৈরিণী না হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। কবি তাঁর আলোকপিয়াসী শব্দসৈনিকদের ভাগে যাতে কম আলো না পড়ে সে ব্যাপারে অনাদি যুগের বিশ্বাসী সেবক সূর্যকে রসদ জোগানোর দায়িত্ব দিয়েছেন। প্রকৃতির বারোটি মাসের প্রতি কবির তীক্ষ্ণ দৃষ্টি; থিয়েটারের নিপুণ নটির মতো প্রতিটি মাস যাতে ঋতুর 'নিখুঁত সাজপোষাকে' সজ্জিত হয়ে পৃথিবীবক্ষে আবর্তিত হয়।

কবির কবিতার শব্দসৈনিকরা পৃথিবীর গ্রন্থালয়গুলোতে ছড়িয়ে পড়েছে; যে গ্রন্থাগারগুলোতে অতীত কবিদের আত্মা কালি ও কলমের পটভূমিকায় বন্দি। কবি তাঁর কবিতার ঘোষণাপত্র লিখতে গিয়ে পৃথিবীর সমস্ত কবিদের শরণাপন্ন হওয়ায় কবির কাব্যগত প্রাতিস্বিক অস্তিত্বের সচেতনতা স্পষ্টতা পায়।

পুরোনো পৃথিবীর কলকব্জায় মরচে ধরেছে বলে কবি ধন্বন্তরী আত্মাদের প্রতি 'ম্যাসেজ রীলে' করেছেন 'সারিয়ে তুলুন পৃথিবীকে, সুন্দরীর হৃত/যৌবন ফিরিয়ে দিন।'
বা

'আমি মূর্চ্ছাহত আত্মাদের জাগিয়ে তুলতে নির্দেশ/দিয়েছি/এবং বলেছি তারা যেনো আবাবিল পক্ষীর মতো/ভূমণ্ডলে চক্রমণ করেন।'
কবি প্রেমিকদের কানে কানে বলেছেন, বেদনার গভীর প্রগাঢ়তা জীবনময়তায় ভাস্বর হয়ে যাতে উজ্জ্বল বিজলি শিখায় জ্বলে। কবি যুবতী প্রেমিকাদের সজ্জার সঙ্গে প্রকৃতির সম্পৃক্ততা কাব্যিক নৈপুণ্যে তুলে ধরেছেন
'যুবতীদের প্রতি রঙিন প্ররোচনা/কৃষ্ণচূড়ার বন লুট করে খোঁপায় কেশে/আগুন বরণ ফুল গুঁজে, জোছনা রাতের/আবছা আঁধারে মনের মানুষের হাত ধরে/বেরিয়ে পড়ো, বেরিয়ে পড়ো সব/পথে পথে অমৃত নির্ঝর, পেয়ালা/ভরো আর পান করো/রক্তিম মদের ফেনার মতো লোহিত যৌবন উপচে/উঠুক।'
'ঘোষণাপত্র' কবিতায় আহমদ ছফার কাব্য-ভাবনার ক্ষেত্রে স্বতন্ত্র-চিহ্নিত ভাবনা প্রকাশিত, যা প্রাতিস্বিক, প্রবল ও দূরগামী। প্রবীণ বয়সেও কেউ তাঁর মনের মধ্যে কবিতার আবেগ ও শিহরণ ধারণ করতে পারেন; কিন্তু বাংলাদেশের বৃদ্ধ পণ্ডিতগণ অধিকাংশই কবিতাবেগী নন; তাই ছফা তাঁর কবিতায় যৌবন-চিত্তের বন্দনা করেছেন এবং প্রবল কাব্যিক শক্তিমত্ততায় কবিতাকে আপন অস্তিত্ব প্রাঙ্গণে স্থাপন করেছেন।
'রাখী' কবিতায় কবির বাঁচার ঘনিষ্ঠতম উপকরণ যে প্রেম তা ব্যক্ত করেছেন। পূর্বরাগের অনুরাগে রাঙা রক্তিম লগ্নে ভালোবেসে ভালোবাসার গান গেয়ে তিনি বাঁচতে চান। তাঁর এ প্রেমের অনুরাগের সঙ্গে প্রকৃতি-প্রাণতাও গভীরভাবে সম্পৃক্ত। কবি প্রচ্ছায়াঘন হিজলতল এবং দিঘির জলে কম্পমান চাঁদের ছায়া দেখে এবং তারাভরা আকাশ দেখে এবং সঙ্গীতের অনুভবভেদ্যতায় তাঁর জীবনকে নক্ষত্রের দূর দিগন্তের সৌন্দর্যময়তায় আবাহন করতে চান। প্রেমিক কবির ধমনী প্রান্তে নাড়িছেঁড়া ব্যথার শিয়রে রক্তগোলাপের মতো লাল ও উষ্ণ অমেয় প্রেমের শিখা কবি তাঁর অন্তরাত্মায় অনুভব করেন।
কবির ব্যক্তিক অনুভব শূন্যতাগামী নয়; বরং এ পৃথিবীর আলো হাওয়ায়, প্রকৃতি পৃথিবীর মালতী লতা, লাউ, কুমড়োর ডগার মতো বিনম্র মমতায় তিনি তাঁর কাব্যান্তরলোকে সবুজ বন নির্মাণ করেছেন।
কবি সমকাল-সচেতন। তাঁর চতুষ্পার্শ্বের হিংস্র কুটিল লোভাতুর দৃষ্টির তীক্ষ্ণ শরে পলে পলে আহত এ যুগের এক ক্রুশবিদ্ধ যিশাস। মানব কল্যাণে ও কাব্যানুভূতির লালনে কবি দুঃসময়-অতিক্রমী, ত্যাগ-পরায়নতায় ভাস্বর।
ইতিহাস-সচেতন ও দেশপ্রেমিক কবি হারানো রক্তের স্মৃতি, হারানো জীবনের মতো বহন করে চলেন। স্বদেশী ভাইয়ের রক্তে গানের সংরাগ মিশিয়ে প্রশান্তির পুষ্পল দ্বীপ নির্মাণ করতে চান কবি; তিনি তাঁর স্বজন বিয়োগে ব্যাকুল হয়ে ওঠেন, অস্থির হয়ে ওঠেন। কবি সুপ্তোত্থিত হয়ে লাল শাপলার হাসি দেখেন, সর্ষে ফুলের ক্ষেতই কবি শুধু দেখেন না; ভাইয়ের রক্ত ফুলের গালে যে সূর্যরাগে জ্বলছে; তাও তিনি গভীর কাব্যিক বিষণ্ণতায় প্রত্যক্ষ করেন। কবি একটি করুণ সুরের কবরী রচনা করতে চান; কবির সঙ্গে আরো অনেক স্বদেশপ্রেমী অশ্রুমতি নদীতে ভেসে ভেসে নক্ষত্রের দিগন্তে সঙ্গীতের রাখী বাঁধার স্বপ্ন দেখে। কবির অন্তর্গত কাব্যবোধ গীতল রোমান্টিকতা ও বেদনাময়তায় একীভূত হয়ে যায়। কবি রক্তাক্ত হতে থাকেন তাঁর দুঃস্বপ্নের সমকালে। কবি তাঁর কাব্য-অস্তিত্বের মোড়ক থেকে স্বপ্ন বীজ খসিয়ে মূর্ত করে তোলেন অন্য এক স্বপ্নজগৎ। সেখানেও কবি রক্তাক্ত হন
'আঘাতে আঘাতে রক্ত গড়িয়ে পড়ছে/একেক ঝলক রক্ত একেকটি লাল বর্ণের/কম্পিত সঙ্গীতের কলির মতো/চরণতল রঞ্জিত করে/তৃষিত মৃত্তিকায় অবগাহন করছে।'
'রাখী' কবিতায় কবির ব্যক্তিপ্রেম, স্বদেশপ্রেম বিষণ্ণগম্ভীর কারুণ্যের সঙ্গে কাব্যানুভবের নান্দনিকতায় বিমিশ্রিত হয়েছে।
'না বৈশাখ না জ্যৈষ্ঠ' কবিতায় মূলত প্রতীকীভাবে রবীন্দ্রনাথের জন্মমাস বৈশাখ এবং নজরুলের জন্মমাস জ্যৈষ্ঠের কোনোটিরই প্রতি কবির যে পক্ষপাত নেই, সে প্রসঙ্গটি অভিব্যক্ত হয়েছে। বাংলা কবিতার দুই প্রধান পুরুষের কাব্যধারা সম্পর্কে সচেতনভাবে অবহিত থেকেই কবি তাঁর স্বতন্ত্র কাব্যধারাকেই এখানে প্রবল ও প্রাতিস্বিকভাবে চিহ্নিত করতে চেয়েছেন। কবি বলেন
'রবীন্দ্রনাথের কাছে ঋণী নই আমি/নজরুল কিংবা কোনো ফসিলের স্তরে/হৃদয়ে পাথর বসে।'

কবি আহমদ ছফা নিজের কাব্যিক বলয়ে গভীরভাবে মৃত্তিকালগ্ন এবং কৃষক ও ফসল ফলানোর মানসিক অভিপ্রায়ের অভিযাত্রী। এজন্য তাঁর কাব্যপথ রবীন্দ্রনাথ এবং নজরুল থেকে আলাদা
'আমি তো নিশ্চিত জানি/বাস করি ভিন্ন ভূমণ্ডলে/বন্দী আমি মুক্ত আমি আপন সমাজে।'
কবি তাঁর আপন কৃষিজীবী সমাজে কখনো মুক্ত বা কখনো বন্দি।
কবি বৈশাখ মাসে ডালি দেন না; জ্যৈষ্ঠদিনে ক্রন্দন করেন না; তিনি দু হাতে জন্মের বন্ধন মুক্ত হয়ে অকর্ষিত ক্ষেতে লাঙল চালান। তিনি এক ক্ষ্যাপা চাষা। রাশি রাশি প্রাণভরা বীজ কুমারী মাটিতে তিনি অনুরাগে ঢালেন এবং শস্যের শিশুর কানে মন্ত্র উচ্চারণ করে আষাঢ়ের জলধারায় বীজকে অঙ্কুরিত করে সবুজকে আবাহন জানিয়ে পক্ব শস্যের জন্য অপেক্ষারত থাকেন
'দেখবো রেখেছে মাথা আলের শিথানে/বিস্তীর্ণ দিগন্ত জুড়ে আনন্দের ধান/আমার প্রাণের প্রাণ স্বপ্নের বিস্তার।'
বৈশাখে জন্ম যে কবি রবীন্দ্রনাথের, তাঁর কণ্ঠ নিঃসৃত বাণী কবির কাছে মাতৃগর্ভে শোনা অস্ফুট নিঃশ্বাস বলে মনে হয়। নজরুলের বিদ্রোহের অগ্নিকুণ্ডে মৃত অঙ্গারের লোভে চপল শিশুর মতো কখনো যাননি তিনি। তাই তাঁর কাব্য ভুবনের তিনি স্বতন্ত্র নির্মাতা এবং বাংলা কাব্যসাহিত্যে তিনি এক স্বতন্ত্র শক্তিশালী অস্তিত্ব। আহমদ ছফার ঘোষণা
'খোঁড়া হই, অন্ধ হই জ্ঞাত আছি বিলক্ষণ/আমি তবু স্বতন্ত্র ঈশ্বর/আমারো ধ্যানের গাঙে প্রতিদিন জাগে নয়া চর।'
কবির ধ্যানের নদীতে প্রতিদিন নতুন কবিতার চর জাগে। রবীন্দ্রনাথ বা নজরুলের কাব্য বিষয় নিয়ে তাঁর কারবার নয়; তাই সচেতনভাবে তিনি বাংলা কবিতার স্বতন্ত্র ঈশ্বর। তিনি খোঁড়া এবং অন্ধ কি না তা তিনি জ্ঞাত আছেন বলাতে তাঁর কাব্য ক্ষমতার পরিপার্শ্ব, প্রাতিস্বিকতা এবং দূরদর্শিতার স্বতন্ত্র শক্তি তাঁর জানা আছে সে প্রসঙ্গটিই গভীর আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে এখানে ব্যক্ত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ ও নজরুলের কাব্য প্রতিভার স্বাতন্ত্র্য সম্পর্কে সচেতন থেকেও আহমদ ছফার কবিতা যে বাঙালি কৃষি-সংস্কৃতির মহান উত্তরাধিকার তা তিনি স্পর্ধার সঙ্গে ব্যক্ত করেছেন।